#আমি পদ্মজা পর্ব ৪৭

_____
ইট-পাথরের শহরের সবই কৃত্রিম। কৃত্রিমতা ছেড়ে ছায়ায় ঘেরা মায়ায় ভরা গ্রাম, আঁকা-বাঁকা বয়ে চলা নদী-খাল, সবুজ শ্যামল মাঠের প্রাকৃতিক রূপ দেখে তৃষ্ণার্ত নয়নের পিপাসা মিটাতে গিয়ে পদ্মজা আবিষ্কার করল,তার চোখে খুশির জল! সবেমাত্র অলন্দপুরের গঞ্জের সামনে ট্রলার পৌঁছেছে। ট্রলারটি হাওলাদার বাড়ির। আলমগীর ও মগা উপস্থিত রয়েছে। তারা দুজন ট্রলার নিয়ে রেলষ্টেশনের ঘাটে অপেক্ষা করছিল। আমির পদ্মজার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াতেই পদ্মজা বলল,'ইচ্ছে হচ্ছে জলে ঝাঁপ দেই।'
আমির আঁতকে উঠল,'কেন?'
পদ্মজা আমিরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। এরপর বলল,'অল্পতে ভয় পেয়ে যান কেন?

বলতে চেয়েছি,অনেকদিন পর চেনা নদীর জল দেখে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। ডুব দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। ‘
আমির এক হাতে পদ্মজার বাহু চেপে ধরে নিজের সাথে মিশিয়ে বলল,’ তাই বলো!’
পদ্মজা আমিরের দিকে তাকাল। আমিরের গাল ভর্তি দাঁড়ি। ঘন হয়েছে খুব। চোখের দৃষ্টি গাঢ়,তীক্ষ্ণ। পঁয়ত্রিশ বছরের পুরুষ!
অথচ,একটা সন্তান নেই। বাবা ডাক শুনতে পারে না। মানুষটার জন্য দুঃখ হয়। পদ্মজা গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

আযান পড়ছে। ট্রলার মোড়ল বাড়ির ঘাটে ভীড়ে। প্রথমে পদ্মজার চোখে পড়ে রাজহাঁসের ছুটে চলা। ঝাঁক ঝাঁক রাজহাঁস দৌড়ে বাড়ির ভেতর ঢুকছে।
হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক শব্দে চারিদিক মুখরিত। ট্রলারের শব্দ শুনে পূর্ণা,প্রেমা,প্রান্ত,ছুটে আসে

ঘাটে। আগে আগে আসে পূর্ণা। পদ্মজা প্রথম সিঁড়িতে পা রাখতেই পূর্ণা জান ছেড়ে ডেকে উঠল,'আপা।'
পূর্ণাকে এভাবে ছুটে আসতে দেখে পদ্মজা ভয় পেয়ে যায়। সাবধান করে,'আস্তে পূর্ণা।'
বলতে বলতে সিঁড়িতে পূর্ণার পা পিছলে গেল। পদ্মজা দ্রুত আঁকড়ে ধরে। এখুনি অঘটন ঘটে যেত! পদ্মজা পূর্ণাকে ধমক দিতে প্রস্তুত হয়, তখনই পূর্ণা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে পদ্মজাকে। বুকে মাথা রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে উচ্চারণ করল,'আপা! আমার আপা!'

পদ্মজার বুক বিশুদ্ধ ভালোলাগায় ছেয়ে গেল। মৃদু হেসে পূর্ণাকে কিছু বলার জন্য আবার প্রস্তুত হয়,তখন প্রেমা,প্রান্ত এসে জড়িয়ে ধরল। পদ্মজা টাল সামলাতে না পেরে শেষ সিঁড়ি থেকে নদীর জলে পড়ে যাচ্ছিল,ট্রলারের আগায় দাঁড়িয়ে থাকা আমির দুই হাতে দ্রুত

পদ্মজাকে আঁকড়ে ধরে তার খুঁটি হলো।
পদ্মজা চোখ খিঁচে ফেলে। যখন বুঝতে পারল সে পড়েনি,তার ভাইবোনেরাও পড়ে যায়নি তখন চোখ খুলল। ঘাড় ঘুরিয়ে তার সহধর্মীর মুখ দেখে হাসল। এরপর সোজা হয়ে দাঁড়াল।
পূর্ণা, প্রেমা হেঁচকি তুলে কাঁদছে! খুশিতে কেউ এভাবে কাঁদে? তবে পদ্মজার ভালো লাগছে।
বাসন্তীকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পদ্মজা তার ভাই-বোনদের বলল,'আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিবি না তোরা?'
পূর্ণা চোখের জল মুছতে মুছতে বলল,'চলো।'
পদ্মজা সিঁড়ি ভেঙে বাসন্তীর সামনে এসে দাঁড়াল। সাদা রঙের শাড়ি পরে ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকা এই মানুষটার প্রতি পদ্মজার অনেক ঋণ। হেমলতা মারা যাওয়ার ছয় মাসের মাথায় মোর্শেদ পৃথিবী ছাড়েন। শোকে খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফেলে

যান কিশোরী দুই মেয়ে,বউ এবং এক ছেলেকে। অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়। সংসার চলে না। আমির সাহায্য করতে চেয়েছিল। পদ্মজার আত্মসম্মানে লাগে। সে কিছুতেই স্বামীর টাকায় বাবার বাড়ির সংসার চালাবে না। নিজেরও কাজ করার উপায় ছিল না। এমতাবস্থায় বাসন্তী চাইলে ফেলে চলে যেতে পারতেন। তিনি যাননি। এক পড়ন্ত বিকেলে পদ্মজাকে বললেন,'নকশিকাঁথা সেলাই করতে পারি আমি। শখে সেলাই করতাম। দুই তিনজন পয়সা দিয়ে কিনতে চাইত। টাকার দরকার ছিল না,তাই বিক্রি করিনি। তুমি বললে,আমি নকশিকাঁথা গঞ্জে বেঁচার চেষ্টা করতাম।'

পদ্মজা সেদিন অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। বাসন্তী ছুটে ঘরে যান। একটা নকশিকাঁথা নিয়ে আসেন। পদ্মজাকে দেখান। অসম্ভব সুন্দর

হাতের কাজ! আমির নকশিকাঁথা দেখে মুগ্ধ হলো। সঙ্গে সঙ্গে বলল,বড় ভাইয়া যখনি ঢাকা যাবে নকশিকাঁথা দিয়ে দিবেন। শহরে নকশিকাঁথার চাহিদা রয়েছে অনেক। আপনাদের সমস্যা কিছুটা হলেও ঘুচে যাবে। এক কাজ করলেই তো পারেন আরো দুই-তিনজনকে নিয়ে নকশিকাঁথা বানানো শুরু করেন। তাহলে অনেকগুলি হবে। তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে দিবেন। ঢাকা বিক্রির পর দ্বিগুণ টাকা আসবে।’

এ প্রস্তাবে পদ্মজা অমত করল না। সেদিন থেকে বাসন্তী দুই হাতে দিনরাত পরিশ্রম করছেন। পূর্ণাকে মেট্রিক অবধি পড়ালেন। প্রেমা,প্রান্তকে এখনও পড়াচ্ছেন। পূর্ণার যেকোনো আবদার পূরণ করে চলেছেন। বাসন্তীর পা ছুঁয়ে পদ্মজা সালাম করল। এরপর বলল,’কেমন আছেন আপনি?’

‘ভালো আছি মা। তুমি, জামাইবাবা সবাই ভালো আছোতো?’
‘আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। আগের চেয়ে শুকিয়েছেন। ত্বক ময়লা হয়েছে। নিজের যত্ন নেওয়া ভুলে গিয়েছেন?’
বাসন্তী চোখ নামিয়ে হাসেন। এক হাতে নিজের মুখশ্রী ছুঁয়ে বলল,’সেই বয়স কী আর আছে? বিধবা মানুষ!’
‘পূর্ণা খুব জ্বালায় তাই না? বাধ্য করে রঙিন শাড়ি পরতে,সাজতে।’
বাসন্তী চমকে তাকালেন। পদ্মজা হাসছে। পূর্ণা মাথায় ব্যাগ নিয়ে পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়াল। আহ্লাদী হয়ে অভিযোগ করল,’আপা তুমি নাকি মুচির সাথে আমার বিয়ে দিতে এসেছো?’
পদ্মজা হাসি প্রশস্ত হয়। আমিরের দিকে তাকিয়ে এরপর পূর্ণার দিকে তাকাল। বলল,’কে বলেছে? তোর ভাইয়া?’

পূর্ণা আমিরকে ভেংচি কেটে পদ্মজাকে বলল,'আর কে বলবে? আপা আমি মুচি বিয়ে করব না। আমার ফর্সা, চকচকে জামাই চাই।'
মগা পূর্ণাকে রাগানোর জন্য বলল,'মেট্রিক ফেইল করা ছেড়িরে ধলা জামাই হাঙ্গা করব না।'
পূর্ণা কিড়মিড় করে তাকাল। পদ্মজা পূর্ণার গাল টেনে দিয়ে বলল,'আচ্ছা,এসব নিয়ে পরে আলোচনা হবে। অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে চারপাশ। বাড়িতে চল।'

তারপর দুই হাতে দুই বোন-ভাইকে জড়িয়ে ধরে বাড়ির উঠানে পা রাখে সে। সতেজ হয়ে জামাকাপড় পাল্টে নেয় আমির ও পদ্মজা। এরপর রাজহাঁস ভূনা আর গরম গরম ভাতের ভোজন হয়। আলমগীর, মগাও ছিল।
আলমগীর বাড়ি ফেরার আগে আমির-পদ্মজাকে বলে যায়,'আগের স্মৃতি আর

কতদিন বুকে রাখবি তোরা? দাদু মরার পথে। চাচি আম্মা আত্মগ্লানি আর তোদের না দেখার শোকে শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে গিয়েছে।
এবার অন্তত বাড়িতে আসিস। অনুরোধ রইল আমার। পদ্মজা তুমি আমিরকে বুঝিয়ো।'
পদ্মজা আশ্বস্ত করে বলল,'এবার বাড়ির সবাইকে গিয়ে দেখে আসব। আপনি নিশ্চিন্তে যান।'
'অপেক্ষায় থাকব।"
'আসব ভাইয়া।' বলল পদ্মজা।
আলমগীর, মগা চলে গেল। আমির পদ্মজাকে বলল,'আমি যাব না।'
'এবার যাওয়া উচিত। অনেক তো হলো। চার বছর কেটেছে। ভয়ংকর রাতটা আজীবন বুকে তাজা হয়ে থাকবে। তাই বলে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারি না। ইসলামে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম।'

‘ওই বাড়িতে গেলে আমার দমবন্ধকর কষ্ট হয় পদ্মজা।’
‘সে তো আমারও হয়। কিন্তু আম্মার কথা খুব মনে পড়ে। আম্মারতো কোনো দোষ ছিল না। তবুও শাস্তি পাচ্ছেন।’
‘ছিল দোষ।’
‘যে আসল দোষী তার দেখা আজও পেলাম না। অথচ,যিনি দোষী না তিনি সবার চোখে দোষী।’
‘আম্মা সেদিন কেন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? এটাই আম্মার দোষ।’
‘জোর করে ঘুম আটকিয়ে রাখা যায়? আমরা আগামীকাল যাচ্ছি,এটাই শেষ কথা।’
‘পদ্মজ....’

আমিরের বাকি কথা পদ্মজা শুনল না। সে হেমলতার ঘরের দিকে এগুলো। হেমলতার ঘরের দরজা খুলতেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়। শিহরিত হয়ে কেঁপে উঠে সে। ছয় বছর

আগের মতোই সব। নেই শুধু মা! পদ্মজা ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে। আলমারি খুলে হেমলতার শাড়ি বের করে ঘ্রাণ শুঁকে। বুকের সাথে জড়িয়ে রাখে। গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। হাউমাউ করে কান্নাটা আসে না অনেকদিন। কষ্টগুলো চেপে থাকে বুকের ভেতর। পূর্ণা দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আপাকে দেখছে। পদ্মজা বার বার নাক টানছে। অজস্র চুমুতে ভরিয়ে দিচ্ছে মায়ের শাড়ি। যেন সে শাড়ি না তার মাকেই চুমু দিচ্ছে। পূর্ণার মন ব্যথায় ভরে উঠে। তার কী মায়ের জন্য কষ্ট হচ্ছে নাকি আপার কান্না দেখে কষ্ট হচ্ছে? জানে না পূর্ণা। শুধু উপলব্ধি করছে,তার কান্না পাচ্ছে।

কান্নার শব্দ শুনে পদ্মজা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। পূর্ণাকে কাঁদতে দেখে,দ্রুত চোখের জল মুছে হাতের শাড়ি আলমারিতে রাখল। এরপর

পূর্ণাকে ডাকল,’আয় এদিকে।’
পূর্ণা ফোঁপাতে ফোঁপাতে এগিয়ে আসে।
পদ্মজা বিছানায় বসল। পূর্ণা পদ্মজার কোলে মাথা রেখে কাচুমাচু হয়ে শুয়ে পড়ল। পদ্মজা বলল,’বয়স একুশের ঘরে। মনটা তো সেই চৌদ্ধ-পনেরো বছরেই পড়ে আছে।’
পূর্ণা পদ্মজার এক হাত মুঠোয় নিয়ে বলল,’আমার খুব কান্না পাচ্ছে।’
‘কাঁদিস না।’
‘ঠেলেঠুলে বেরিয়ে আসছে তো।’
‘থামানোর চেষ্টা কর।’
‘থামছে না।’
‘তুই তো আরো কাঁদছিস।’
‘বেড়ে যাচ্ছে তো।’
পদ্মজা ঠাস করে পূর্ণার গালে থাপ্পড় বসাল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণার কান্না থেমে যায়। চোখ বড় বড় করে তাকায়। পদ্মজা আওয়াজ তুলে হেসে

উঠে। পূর্ণা দ্রুত উঠে বসে। হাত ঝাড়তে ঝাড়তে হেসে বলল,’থেমে গেছে।’

পদ্মজার হাসি বেড়ে গেল। মুখে হাত চেপে হাসি আটকানোর চেষ্টা করে।
হাসির ঠ্যালায় চোখে জল চলে আসে। পূর্ণা কান্না নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। থামাতে বললে,আরো বেড়ে যায়। ব্যাপারটা যে কেউ উপভোগ করে। প্রেমা ঘরে ঢুকে অভিমানী কণ্ঠে বলল,’আমাকে ছাড়া কী নিয়ে কথা বলে হাসা হচ্ছে?’
পদ্মজা হাসতে হাসতে বলল,’পূর্ণা কাঁদছিল। থামাতে পারছিল না।’
প্রেমা হেসে বিছানায় উঠে বসে। দুই পা ভাঁজ করে বসে বলল,’ বড় আপা,ছোট আপা নামায পড়ে না।’

পদ্মজা হাসি থামিয়ে পূর্ণার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল,’কী রে? তুই নামায পড়িস না

কেন? চিঠিতে তো বলিস অন্য কথা।’
পূর্ণার ইচ্ছে হচ্ছে প্রেমাকে লবণ,মরিচ দিয়ে ক্যাচ ক্যাচ করে কাঁচা আমের মতো কামড়ে খেতে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সামলাতে হবে। সে পদ্মজাকে বোঝানোর চেষ্টা করল,’আপা,বিশ্বাস করো শুধু এক ওয়াক্ত পড়িনি। আর...আর প্রেমাকে আমি আমার...হ্যাঁ আমার চুড়ি দেইনি বলে...’
‘মিথ্যে বলবি না। কতবার বলেছি,মিথ্যা কথা ছাড়তে। সত্য স্বীকার কর। কীসের কাজ তোর? পড়ালেখা ছেড়েছিস,চার বছর। মেট্রিকটা আবার পড়লি না। বিয়ে করতে চাস না বলে বিয়ের জন্যও জোর করিনি। তার মূল্য এভাবে কথা না শুনে দিবি? এটা তো আমারও কথা না। যিনি সৃষ্টি করেছেন উনার আদেশ।’

পূর্ণা মাথা নত করে রাখে। পদ্মজা বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল,’ঘুমাব না তোদের

সাথে।’
প্রেমা আর্তনাদ করে উঠল,’আপা,আমার দোষ কী?’
পূর্ণা পদ্মজার কোমর জড়িয়ে ধরে। কিছুতেই যেতে দিবে না। পদ্মজা বলল,’ছাড় বলছি।’
পূর্ণা আকুতি করে বলল,’যেও না। এখন থেকে প্রতিদিন পড়ব। সত্যি বলছি।’
‘সত্যি তো?’ বলল পদ্মজা।
‘সত্যি।’
পদ্মজা বিছানায় পা তুলে বসল। পূর্ণা আড়চোখে প্রেমাকে দেখল। দৃষ্টি দিয়ে যেন হুমকি দিল,’আমারও দিন আসবে!’

গ্রামে আসলে আমির প্রান্তর সাথে ঘুমায়। পদ্মজাকে তার বোনদের সাথে ছেড়ে দেয়। আজও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। দুই বোনকে নিয়ে শুয়ে পড়ে পদ্মজা। কত কত গল্প তাদের! পদ্মজা শুধু শুনছে আর হাসছে। প্রেমার মুখ

দিয়ে সহজে কথা আসে না,পদ্মজা আসলে কথার ঝুড়ি নিয়ে বসে। পূর্ণা নিজের বিয়ে নিয়ে বেশি কথা বলছে। পরিকল্পনা করছে। তখন প্রেমা ব্যাঙ্গ করে বলল,'ছোট আপার লজ্জার লেশমাত্র নেই।'

তখন পূর্ণা ক্ষেপে গিয়ে বলল,'তুই যে প্রান্তরে বলছিলি শহরে গিয়ে সাহসী পুলিশ বিয়ে করবি। আমি কাউকে বলেছি? বলেছি,তোর লজ্জা নাই?
প্রেমা লজ্জায় জবুথবু হয়ে যায়! তার বড় আপার সামনে ছোট আপা কী বলছে! লজ্জায় কান দিয়ে ধোয়া বেরোতে থাকে। পদ্মজা হাসল। প্রেমাকে বলল, 'লজ্জার কিছু নেই। অভিভাবকদের নিজের পছন্দ জানানো উচিত। তোর বিয়ে পুলিশের সাথেই হবে। আর পূর্ণার বিয়ে হবে পূর্ণার পছন্দমত।'

পদ্মজার কথায় পূর্ণা ভারি খুশি হলো। সে আবেগে আপ্লুত হয়ে বলল,' নায়কের মতো জামাই চাই। একদম লিখন ভাইয়ার মতো। ওহ আপা, জানো লিখন ভাইয়া এখানে শুটিং করতে আসছে। এক সপ্তাহ হলো।'
পদ্মজা জানতে চাইল,'কার বাড়ি?'
'সাতগাঁয়ের হান্নান চাচার বাড়ি। বিশাল বড় টিনের বাড়ি।'

পদ্মজা চুপ হয়ে গেল। এই মানুষটা শুধুমাত্র তার স্মৃতি। কিন্তু মানুষটার জীবনের পুরোটা জুড়ে সে। এইতো মাস চারেক আগে, পদ্মজা পত্রিকা পড়তে বসেছিল। তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখন শাহর ছবি সাথে উপরের শিরোনাম দেখে বেশ অবাক হয় পদ্মজা। শিরোনামে লেখা, 'লিখন শাহর পদ্ম ফুল'। পদ্মজা আগ্রহ নিয়ে প্রতিটি লাইন পড়ে। সাংবাদিক লিখনকে প্রশ্ন করেছেন, 'ত্রিশ তো পার হয়েছে। বিয়ে

করবেন কবে?’
লিখন জানিয়েছে,’সে যখন আসবে।’
‘আমরা কী জানতে পারি,কে সে? যদি দ্বিধা না থাকে।’
‘জানাতে আমার বাধা নেই। সে পদ্ম ফুল। আমার সাতাশ বছরের কঠিন মনে তোলপাড় তুলে দিয়েছিল। সেই তোলপাড়ের তাণ্ডব বুকের ভেতর আজও হয়। সেই ফুলের সুবাস নাকে আজও লেগে আছে। শুধু আমি তাকে জয় করতে পারিনি।’

লিখন শাহর সাক্ষাৎকারের কথোপকথন বেশ তোলপাড় তুলে ঢাকায়। এরকম একজন সুদর্শন পুরুষকে কোন নারী অবহেলা করেছে? তা নিয়ে মানুষের কত কল্পনা-জল্পনা, আলোচনা -সমালোচনা। পদ্মজার অস্বস্তি হয় খুব।

পূর্ণা পদ্মজাকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ডাকল,'ঘুমিয়ে গেলে আপা?'
'না। তারপর বল।' নিস্তরঙ্গ গলায় বলল পদ্মজা।

ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক,শিয়ালের হাঁক ভেসে আসছে কানে। রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। তবুও কথা শেষ হচ্ছে না পূর্ণা-প্রেমার। পদ্মজাও মানা করছে না। বরং অবাক হচ্ছে,তার বোনেরা কত কথা লুকিয়ে রেখেছে তার জন্য!

_____

কাক ডাকা ভোর। ঘন কুয়াশায় চারপাশ ডুবে আছে। বাতাসের বেগ বেশি। ঠান্ডায় ঠোঁট কাঁপছে। পদ্মজার পরনে দামী,গরম সোয়েটার। আবার শালও পরেছে। বাসন্তী সুতি সাদা শাড়ি পরে রান্না করছেন। মাঝে মাঝে কাঁপছেন। পদ্মজা দ্রুত পায়ে রান্না ঘরে ঢুকল।

বাসন্তী পদ্মজাকে দেখে হেসে বললেন,'কিছু লাগবে?'
পদ্মজা খেয়াল করে দেখল বাসন্তীর মুখটা ফ্যাকাসে। ঠান্ডায় এমন হয়েছে। সে শক্ত করে প্রশ্ন করল,'আপনার শীতের কাপড় নেই?'
বাসন্তী হেসে বলল,'আছে তো।'
'তাহলে এভাবে শীতে কাঁপছেন কেন? নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। বয়স হয়েছে তো। যান ঘরে যান।'
'ভাত বসিয়েছি।'
'আমি দেখব।'
'সারারাত তো সজাগ ছিলে আম্মা। তুমি ঘুমাও। আমি রাতে ঘুমিয়েছি।'
'তাহলে সোয়েটার পরে আসেন।'
বাসন্তী মাথা নত করে বসে রইলেন। পদ্মজা বেশ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। এরপর নিজের গায়ের শাল বাসন্তীর গায়ে দিয়ে

বলল,’নিজের জন্যও কিছু কেনা উচিত। পূর্ণা বয়সে বেড়েছে বুদ্ধিতে না। ও পারে না কিছু সামলাতে। শুধু আবদার করতে পারে। যতদিন বেঁচে আছেন নিজের যত্ন নিন। আমি ঘরে যাচ্ছি।’

পদ্মজা রান্নাঘর ছেড়ে বারান্দার গ্রিলে ধরে বাইরে তাকাল। কুয়াশার জন্য বাড়ির গেইটও দেখা যাচ্ছে না। সে ঘুরে দাঁড়াল ঘরে ঢোকার জন্য। তখন মনে হলো, উঠানে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা আবার ঘুরে তাকাল। দেখতে পেল,তার শ্বাশুড়ি ফরিনাকে। তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে আছে। শুকিয়েছে খুব বেশি। গায়ে লাল-সাদা রঙের মিশ্রণে শাড়ি। ফরিনার চারপাশে উড়ো কুয়াশা। কুয়াশার দেয়াল ভেদ করে যেন তিনিই শুধু আসতে পেরেছেন। পদ্মজা হন্তদন্ত হয়ে বের হলো। কাছে এসে দাঁড়াতেই বুকটা হুহু করে উঠল।

ফরিনা পদ্মজাকে দেখে কেঁদে দিলেন। পদ্মজা ফরিনার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। পা ছুঁয়ে সালাম করল। এরপর ফরিনার ঠান্ডা দুই হাত ধরে বলল,'এতো সকালে কেন আসতে গেলেন? আমরা তো যেতামই।'
'এতো রাগ তোমার?'
'না,আম্মা। আপনার প্রতি কোনো রাগ নেই আমার। আট মাস আপনি আমার যে যত্ন নিয়েছেন মায়ের অভাববোধ করিনি। মনে হয়েছিল, আমার মা ছিল আমার পাশে।'
'তাইলে কেরে যাও না আমার কাছে? আমার ছেড়ায় কেন মুখ ফিরায়া নিছে আমার থাইকা?'
'উনি পাগল। আম্মা, আপনি কেমন আছেন? দেখে বোঝা যাচ্ছে,ভালো নেই। আম্মা বিশ্বাস করুন,আপনার প্রতি আমাদের রাগ নেই। ওই বাড়িটা দেখলে খুব কষ্ট হয় আম্মা। খুব যন্ত্রনা হয়। এজন্য যাই না। আপনাকে অনেকবার

চিঠি লিখেছি, যেন ঢাকা গিয়ে কয়দিন থেকে আসেন। গেলেন না কেন?’
ফরিনা অবাক হয়ে বললেন,’আমার কাছে তো কুনু চিডি আসে নাই।’
‘সেকী! আমি তো এই চার বছরে ছয়টা চিঠি লিখেছি আপনার নামে। পাঠিয়েছিও।’
‘আমি তো পাই নাই।’
ফরিনা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পদ্মজা বলল, ‘আচ্ছা এ ব্যাপারে কথা বলব উনার সাথে। আমি যখন আম্মার কবর জিয়ারত করতে আসি তখনও তো এসে আমাকে আর উনাকে দেখে যেতে পারতেন আম্মা।’
‘তোমরা বাড়িত যাও না বইলা,আমি ভাবছি আমারে ঘেন্না করো তোমরা তাই সামনে আইতে পারি নাই। আমার জন্যও আমার নাতনিডা...’

ফরিনা হুহু করে কেঁদে উঠলেন। পদ্মজার চোখ ছলছল করে উঠল। সে ফরিনাকে বলল,'আপনার জন্য কিছু হয়নি আম্মা। আপনি এভাবে ভাববেন না। কান্না থামান।'

'যতই বলো মা,কান্না থামাবে না। চার বছর ধরে এভাবে কাঁদছে।'
মজিদের কণ্ঠস্বর শুনে পদ্মজা দ্রুত ঘোমটা টেনে নিল। মজিদকে সালাম করে বলল,'ভালো আছেন আব্বা?'
'এইতো আছি কোনোমতে।'
'আম্মা,আপনি কান্না থামান। আমার খারাপ লাগছে।'
ফরিনা আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছলেন। এরপর বললেন,'আমার বাবু কই?'
'ভেতরের ঘরে ঘুমাচ্ছে। ডেকে দিচ্ছি।'
'না,থাহক। ঘুমাক।'

পদ্মজা শ্বশুর, শ্বাশুড়িকে সদর ঘরে নিয়ে আসে। আস্তে আস্তে সবার ঘুম ভাঙে। আমির যত যাই বলুক, মাকে দেখেই নরম হয়ে যায়। জড়িয়ে ধরে বাচ্চাদের মতো কাঁদতে শুরু করে। মজিদ ছেলে আর ছেলের বউকে ছাড়া কিছুতেই বাড়ি যাবেন না। কম হলেও চার-পাঁচ দিন থেকে আসতে হবে। অবশেষে, আমির রাজি হলো। প্রেমার সামনে পরীক্ষা তাই প্রেমাকে সাথে নিল না। বাসন্তী, প্রেমা,প্রান্ত বাড়িতে রয়ে যায়। পূর্ণা সাথে যায়।

_____

হাওলাদার বাড়ির গেইট পেরিয়ে ভেতরে পা দিতেই পদ্মজার সর্বাঙ্গ অদ্ভুত ভাবে কেঁপে উঠে। সূর্য উঠেনি। দমকা বাতাস হচ্ছে। সেই বাতাসে সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছে। মাথার উপর দিয়ে বাজপাখি উড়ে যায়। সেই পাখির ডাক অদ্ভুত হাহাকারের মতো। যেনও মনের চেপে রাখা

কষ্ট ও ক্ষোভ নিয়ে কেউ আত্মচিৎকার করছে। নাকি এটা নিছকই পদ্মজার ভাবনা? চারদিকে চোখ বুলাতে বুলাতে আলগ ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলের সামনে এসে দাঁড়াল সে। চার বছর পূর্বেই তো এখানে এই জায়গাটায় তার আদরের তিন মাসের কন্যা পারিজার রক্তাক্ত লাশ পড়ে ছিল! পদ্মজার বুক কেমন করে উঠল! বুকে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। আমির উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল,'খারাপ লাগছে?'
পদ্মজা স্বাভাবিক হয়ে বলল,'না।'
থামল, নিঃশ্বাস নিল। এরপর বলল,' পূর্ণাকে দেখুন,কেমন পাগল।'

আমির সামনে তাকাল। পূর্ণা মাথার উপর ব্যাগ নিয়ে সবার আগে বড়ই খেয়ে খেয়ে কোমর দুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে! অন্দরমহলের সামনে এবং আলগ ঘরের পিছনের মধ্যিখানে টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। হেমন্তকালে ধান

কাটা হয়েছে,তখন কামলারা আলগ ঘরে থেকেছে। তাদের জন্যই এই টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল। টিউবওয়েলের চারপাশে গোল করে সিমেন্ট দিয়ে মেঝেও করা হয়েছে। সব মিলিয়ে একটা কলপাড় তৈরি হয়েছে। পূর্ণা নারিকেল গাছের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। কলপাড়ে এক সুদর্শন যুবক পিঁড়িতে বসে গোসল করছে। পরনে লুঙ্গি। রানি গামছা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী যেন বলছে। পূর্ণা ব্যাগ রেখে হা করে সেই যুবককে পরখ করে। সুঠম,সুগঠিত শরীর,মায়াবী- ফর্সা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক। প্রশস্ত বুকে ঘন পশম। চওড়া পিঠ। শক্তপোক্ত দেখতে দুই হাত। ডান হাতে ছোট কলস নিয়ে মাথায় পানি ঢালছে। সেই জল চুল থেকে কপাল,কপাল থেক ঠোঁট,ঠোঁট থেকে বুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ চুল ঝাঁকি দিয়ে উঠল। জলের ছিটা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। রানি যুবকটিকে বকতে বকতে দূরে সরে

দাঁড়ায়। যুবকটি আবারও মাথায় পানি ঢেলে চুল ঝাঁকায়। উদ্দেশ্য, রানিকে ভিজিয়ে দেয়া। পূর্ণা মুগ্ধ হয়ে গেল। সে দ্রুত ব্যাগ মাটিতে রেখে দিল। ওড়না ঠিক করে,চুল ছেড়ে দিল। এরপর কলপাড়ের দিকে হেঁটে গেল। ঠোঁটে তার হাসি। চোখের দৃষ্টি দেখলে যে কারো মনে হবে, পূর্ণা অপরিচিত এই যুবকটিকে চোখ দিয়ে পিষে ফেলছে। কলপাড়ের পাশে ভেজা কাদা ছিল। পূর্ণা পা রাখতেই পিছলে পড়ে যায়। ধপাস শব্দ শুনে যুবকটি লাফিয়ে উঠে ভরাট কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, ‘বোয়াল মাছ! বোয়াল মাছ!’

চলবে...